DECLARATION

I, ***TAPAS KAYAL****, bearing Registration No. : Ph.D/2204/13 Dated 05.04.2013 here by declare that the subject matter of the thesis entitled* ***'রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা : প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ' 'PROVERBS AND IDIOMS IN THE FICTIONAL WORK OF RABINDRANATH TAGORE : APPLICATION AND ANALYSIS'*** *is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any other university / institute.*

This thesis is being submitted to Assam University for the Degree of Doctor of philosophy in BENGALI.

Place : Assam University, Silchar *TAPAS KAYAL*

Date : *Candidate*

সূচিপত্র

সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি ১-৩

প্রাক-কথন : ৪-৬

প্রথম অধ্যায় : ৭-২৭

লোকসাহিত্যের ধারায় প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থকশব্দের স্বরূপ নির্ণয়

দ্বিতীয় অধ্যায় : ২৮-৬৫

লোকসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ : সম্পর্কের খতিয়ান

তৃতীয় অধ্যায় : ৬৬-১০৪

সূচনা থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত রবীন্দ্রছোটো গল্পে প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা : প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ

আলোচ্য গল্প ঃ মুকুট, দেনাপাওনা, পোষ্ট মাষ্টার, রাম কানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, দালিয়া, মুক্তির উপায়, ত্যাগ, এক রাত্রি, একটা আষাঢ়ে গল্প, জীবিত ও মৃত, স্বর্ণমৃগ, জয় পরাজয়, কাবুলিওয়ালা, মহাশয়া, দানপ্রতিদান, সম্পাদক, অসম্ভব কথা, শাস্তি, সমাপ্তি, সমস্যা পূরণ, মেঘ ও রৌদ্র, প্রায়শ্চিত্ত, নিশীথে, আপদ, দিদি, মানভঞ্জন, ঠাকুরদা, প্রতিহিংসা, ক্ষুধিত পাষাণ, অতিথি, দুরাশা, পুত্রযজ্ঞ, অধ্যাপক, রাজটিকা, মণিহারা, দৃষ্টিদান।

চতুর্থ অধ্যায় : ১০৫-১৪০

বিশ শতকের রবীন্দ্রছোটো গল্পে প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা : প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ

আলোচ্য গল্প ঙ্খ সদর ও অন্দর, উদ্ধার, নষ্টনীড়, দর্পহরণ, মাল্যদান, কর্মফল, গুপ্তধন, রাসমণির ছেলে, পণরক্ষা, হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাই ফোঁটা, অপরিচিতা, তপস্বিনী, পয়লা নম্বর, পাত্র-পাত্রী, নামমঞ্জুর গল্প, বলাই, চোরাই ধন, বদনাম, প্রগতিসংহার, লীপিকা গ্রন্থের রাজপুত্তর গল্প, গল্প, সে, তিন সঙ্গী গল্প গ্রন্থের রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরী, গল্প সল্প গ্রন্থের ম্যাজিশিয়ান

পঞ্চম অধ্যায় : ১৪১-১৮২

রবীন্দ্র উপন্যাসে প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা : প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ

আলোচ্য উপন্যাস ঙ্খ করুণা, বউ ঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষি, প্রজাপতির নির্বন্ধ, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, দুইবোন, চার অধ্যায়।

পরিশেষ কথা : ১৮৩-১৮৬

গ্রন্থপঞ্জি : ১৮৭-১৯৪

রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা ঃ প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ

উপস্থাপক : **তাপস কয়াল**

সকৃতজ্ঞ-স্বীকৃতি

২০১০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাষ্টার ডিগ্রি লাভ করার পর, আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শুক্লা চক্রবর্তীর স্নেহ, ভালোবাসা ও সহযোগিতায় ত্রিবান্দ্রমের International School of Dravidian Linguistics গবেষণা কেন্দ্রে জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো হিসাবে গবেষণার সুযোগ পাই। সেখানে বাংলা ক্রিয়াপদের উপর একটি ডিক্সনারী প্রজেক্টে কাজ করার সময় চেষ্টা করতে থাকি পিএইচ.ডি-র জন্য। আমার অনুপ্রেরণা দাতা শ্রদ্ধেয়, অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়। শুধুই অনুপ্রেরণা নয়, তাঁর সহযোগিতা আমাকে পূর্ণ করে দিয়েছে। ২০১২ সালে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে RET পরীক্ষা দিয়ে পিএইচ.ডি-তে সুযোগ পাই। গবেষণার কাজ করতে চেয়েছিলাম তুলনামূলক বিষয় নিয়ে। এমনকি ভাবতেও শুরু করেছিলাম। আমার ভাবনার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য লেখক। তাই রবীন্দ্র কথা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে করতে আলোচ্য বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অধ্যাপক রায় আমাকে কাজের বিষয়বস্তু সম্পর্কে এবং তথ্য সংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে নানা ভাবে উৎসাহিত করেছেন। যা এখনো অনালোচিত, অনাবিস্কৃত। যাদের হার্দিক সহযোগিতায় আজ আমি এখানে, সেই শিক্ষকদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। শুধুই গবেষণা সংক্রান্ত বিষয় নয়, অন্যান্য বিষয়ে ও আমাকে সাহায্য করতে তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁদের তিরস্কার মিশ্রিত স্নেহ ভালোবাসা আমার অনুপ্রেরণার মূল উৎসভূমি।

আর এক দিকে, আমার তত্ত্বাবধায়ক পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী এবং অধ্যাপক বুবুল শর্মার তথ্যসংগ্রহ, অপরিসীম স্নেহ এবং সহানুভূতিশীল নির্দেশ ছাড়া আমি এ কাজ সমাধা করতে পারতাম না। আমার কাজের বিষয়টি তাঁরা একটু একটু করে সমাধানের পথে পরিশেষ কথায় পৌঁছে দিয়েছেন। আমার কোনও জিজ্ঞাসায় তাঁরা বিমুখ করেননি। বরং স্নেহের

সঙ্গে আমাকে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। গুরু এবং মহাগুরুদের প্রতি ঋণ জীবনভর অপরিশোধ্য। শুধুই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নয়, আদর্শ শিক্ষক হিসাবে, পিতৃত্বের স্নেহ দিয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী আমাকে গবেষণার কাজে চালনা করেছেন। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুমন গুণ আমাকে বার বার কাজ সম্পর্কে সচেতন করে উপদেশ দিয়েছেন, তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই অধ্যাপক বেলা দাসকে, যিনি সুপরামর্শ দিয়ে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, এবং বাংলা বিভাগে অন্যান্য অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাকেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। প্রণাম জানাই অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে এবং অধ্যাপক পুরঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে। প্রণাম জানাই অধ্যাপক নীলমোহন রায়কে। যিনি শুধুই গবেষণার সুপরামর্শ দিয়ে নয়, হাওড়া থেকে শিলচর পর্যন্ত যাওয়া আসার পথে যতবার সমস্যায় পড়েছি, তিনি আমাকে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তীকে, যিনি নানা সময়ে আমাকে গবেষণা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। প্রণাম জানাই অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তীকে, আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করার জন্য। আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক প্রয়াত করুণাসিন্ধু দাসকে। ত্রিবান্দ্রমে থাকাকালীন, তিনি ওখানে যতবার গিয়েছিলেন গবেষণা বিষয়ে আমার জিজ্ঞাসাকে সহজ-সরলভাবে সমাধান সূত্র নির্ণয়ে অপরিসীম সাহায্য করেছিলেন। ধন্যবাদ জানাই সতীজীবন দাদাকে। অধ্যাপক সৌরভ চক্রবর্তী ও বিপ্লবদার প্রতি কৃতজ্ঞ। যারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে নানান তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে।

গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে গিয়ে যাঁদের সাহায্য, সহযোগিতা পেয়েছি, বিশেষত — আসাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর সেন্ট্রাল লাইব্রেরী,

বিভাগীয় লাইব্রেরী, ত্রিবান্দ্রমের ডি.এল.এ, আই. এস. ডি. এল. রবীন্দ্রভবন লাইব্রেরী, সন্দীপ দত্তের লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী, কলকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী প্রভৃতি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দের কাছে নানাভাবে সাহায্য পাওয়ায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়েছি। আমার অপরিসীম ভালবাসা রইল গবেষক বন্ধু মৃদুল চক্রবর্তী, অরিজিৎ ভট্টাচার্য, পীযূষকান্তি ভট্টাচার্য, অনুপম সরকার, জয়ন্ত মণ্ডল এর প্রতি।

গবেষণার কাজের জন্য আমি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ আমার বাবা-মা, এবং দাদাদের কাছে, যারা নিজেদেরকে অভুক্ত রেখে আমাকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দিয়েছেন। আমার পরিবারের সকলে এবং শ্রদ্ধেয় পূজনীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের প্রতি আমি চির ঋণী হয়ে থাকলাম।

তারিখ ঃ (তাপস কয়াল)

প্রাক-কথন

মননশীল সাহিত্য সৃষ্টির জগতে নূতন পথের পথ প্রদর্শক হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তিনি শুধুই সৃষ্টিশীল সাহিত্যাকাশে শ্রেষ্ঠ নয়, সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি আজও বর্তমান। তাঁর এই সুমহান ব্যক্তিত্ব অতীত ও বর্তমান শতাব্দীতে অতি দুর্লভ এ কথা পণ্ডিত মহলে নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। তিনি শুধুই একজন কবি নন, তিনি একাধারে বঙ্কিম পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোটোগল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, প্রথমশ্রেণির সাহিত্য সমালোচক, ও সিদ্ধ হস্তের অনুবাদক। সাহিত্যের সব ধারাতেই তাঁর সৃজনশীল পদচারণা ছিল। এই গতিশীল সক্রিয়তা তিনি অর্জন করেছিলেন নিজস্ব রচনা কৌশলের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নগর কলকাতার শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। তাই তাঁর লেখনীতে নগর কলকাতার প্রভাব প্রবল ভাবে লক্ষ করা যায়। যদিও তিনি এই গণ্ডির মধ্যে দীর্ঘদিন আবদ্ধ ছিলেন না। এই সীমারেখা অতিক্রম করে তিনি পৌঁছেছিলেন পল্লীগ্রামের বা প্রান্তীয় মানুষ ও তাদের সমাজের কাছে। তাদের মুখের ভাষাকে তিনি সাহিত্য নবরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পল্লীগ্রাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়ায় এক রবীন্দ্র সংবর্ধনায় বলেছিলেন, — ‘‘লোকে অনেক সময় আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে বলে, উনি তো ধনী ঘরের ছেলে। ইংরাজিতে যাকে বলে রূপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কি জানেন? আমি বলতে পারি আমার থেকে কম জানেন তাঁরা, যারা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা? অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে কি জানা যায়? যথার্থ জানায় ভালোবাসা। ..... আমার রচনাতে পল্লী পরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে কোনও বাঁধা বুলি দিয়ে তার সততাকে উপেক্ষা করলে চলবে না।’’ পল্লীগ্রামের প্রতি এই যে

গভীর অন্তরঙ্গতার অনুভূতি তা তাঁর সাহিত্যের সব ধারাতে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে যা অপাঠ্য অবস্থায় অনুভব করা সম্ভব নয়। এই অন্তরঙ্গতার মধু দিয়ে তিনি আরো বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন পল্লীর লোকায়ত জীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রতি, তাঁর সাহিত্যকর্মে লোকসংস্কৃতির নানান লোক-উপাদান গুলি অনিবার্য ভাবে যোগ্য মূল্য ও মর্যাদা পেয়েছে।

এই মর্যাদা পাওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হল পিতৃদেবের জমিদারি দেখাশুনা, অর্থাৎ জমিদারির তদারকি করার জন্য তাঁকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি ছেড়ে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ আবার কখনো ওড়িষ্যার নানান স্থানে অবাদে ঘোরাফেরা করা, এবং সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে গভীর ভাবে তাঁকে মেলামেশা করতে হয়েছিল। যখন যে পরিবেশে তাঁর যা কিছু ভালো বা মন্দ লেগেছিল, তখন সেটাই তাঁর সাহিত্যের বিষয় বস্তু হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। ফলত ঐ সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে শিষ্টজনের ভাষাতে পরিণত করেননি। বরং ঐ ভাষার পরিবেশ পরিস্থিতিকে অপরিবর্তীত করে মানব সমাজের বাস্তবতাকে অক্ষুন্ন বজায় রাখেন। তবে এটা সবক্ষেত্রে হয়েছে, তা জোর দিয়ে বলার অবকাশ নেই। কখনো কখনো পূর্ববঙ্গের স্মৃতি নিয়ে জোড়াসাঁকোতে বসে সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। আবার কখনো কখনো জোড়াসাঁসোর স্মৃতি নিয়ে উত্তরবঙ্গে কিছু সৃজন করেছেন। তিনি ঐ বাস্তবতার স্বচ্ছতা এবং স্মৃতি কথা বজায় রাখতে গিয়ে, তাঁর হাতের সৃষ্টিশীল সাহিত্যে ভুরি ভুরি পরিমাণে মানব সমাজ তথা মানব জীবনের অতিমূল্যমান সম্পদ, যা কথায় কথায়, চলতে-ফিরতে ব্যবহৃত, অর্থাৎ তিনি প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা এবং বিশিষ্টার্থক শব্দ, শব্দগুচ্ছের কুশলী প্রয়োগ করেন। তাঁর সাহিত্যের ভাষাকে কখন প্রাঞ্জল, আবার কখনও কখনও গুরুগম্ভীর ভাব মাধুর্য পাঠকের কাছে উপস্থাপন করার কৌশল ব্যবহার করেছেন। গল্প, উপন্যাসের Context

অনুযায়ী ঐগুলো কখনও উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে, আবার কখনও সহজ ভাষায় ভাব বিষয়কে হাজির করে পাঠক সমাজকে বোঝাতে চেয়েছেন।

তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যে এই প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা এবং বিশিষ্টার্থক শব্দগুলি কোথাও কোথাও নিজের মতো করে, আবার কোথাও হুবহু কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, চিঠিপত্র, প্রবন্ধের প্রতিটি পর্বে পর্বে এবং চরিত্রের মুখে মুখে বসিয়ে দিয়েছেন স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে। এই কুশলী প্রয়োগের ফলে তাঁর সাহিত্য বাস্তব থেকে বাস্তবচিত হয়ে উঠেছে পাঠক সমাজে। আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা এবং বিশিষ্টার্থক শব্দের প্রয়োগ ও তার বিশ্লেষণের যথার্থতা অনুসন্ধান করে প্রতিষ্টা দেওয়া।